e-paper

পৃথিবীর ডায়েরি

বছর ১৬, সংখ্যা: ৮ | প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক পত্রিকা | ডিসেম্বর ২০১৫

জানা অজানা

ভাল করে খেয়ে স্কুলে যাওয়া ভাল

প্রাতরাশ কেমন হল তার ওপর নির্ভর করে স্কুলে পড়াশোনায় মন বসছে কি না। অর্থাৎ সকালে কী খেয়ে আর কেমন পরিমাণে আহার করে ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে যাচ্ছে তা প্রভাব ফেলে তাদের ফলাফলের ওপর। কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় এ কথা জানা গেছে।

ইংল্যান্ডে ৫,০০০ স্কুলপড়ুয়ার ওপর এক সমীক্ষা চালান হয়। দেখা যায় যারা ভাল আহার করে স্কুলে আসে তারা পরীক্ষায় ভাল ফল পায়, আর যারা প্রাতরাশ ভালভাবে করে না তারা পেছিয়ে থাকে। আবার এও দেখা গেছে যে শুধু খাবারের পরিমাণ যথেষ্ট হলেই হয় না। খাবার কতটা পুষ্টিকর তার ওপরও নির্ভর করে কে কতটা শিখতে পারছে। বলা হচ্ছে ফাস্টফুড বা জাঙ্কফুড বাংলায় যাকে চটজলদি মুখোরোচক খাবার বলা যায় তার কোনও সুফল পাওয়া যায় না, তা যতই খাওয়া হোক না কেন। ফল, সব্জি ও আরও অন্যান্য পুষ্টিকর খাবারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এই গবেষণায়।

সূত্র: ইউরেকাঅ্যালার্ট

পাতারা হাওয়া থেকে জল ধরে

গাছ মাটি থেকে জল তোলে, বাতাস থেকে শুষে নেয় বাষ্প

অনেক গাছ আছে যেগুলি খুব লম্বা হয়। এতই লম্বা যে চার পাঁচ তলা বাড়িকেও ছাড়িয়ে যায় তাদের উচ্চতা। সে সব গাছের মগডালে যে সব পাতা থাকে সেগুলি বেশ ভাল পরিমাণ রোদ পায়। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে জল পায় কি না সে বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মনে সন্দেহ ছিল। কারণ শেকড়ের মারফৎ মাটির অনেক গভীর থেকে বিন্দু বিন্দু শুষে নেওয়া জল একেবারে মগডালের পাতায় তুলে নিয়ে যাওয়া মোটেই সহজ কাজ নয়। মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে যে কোনও জিনিসই ওপরে তোলা বেশ কষ্টসাধ্য। তার জন্য শক্তি লাগে। যেমন একতলা থেকে দোতলা, তিনতলা বা পাঁচতলা বাড়ির ছাদে বসান ট্যাঙ্কে জল তোলার জন্য প্রয়োজন হয় শক্তিশালী পাম্প। সে পাম্প চালাতে লাগে বিদ্যুৎ। আর সেই বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য বিলের টাকা মেটাতে হয় প্রতি মাসে। অর্থাৎ মাটি থেকে জল ওপরে তুলতে কেবল শক্তি ক্ষয়ই নয়, অর্থ ব্যয়ও হয় কিছু পরিমাণ। অথচ গাছেদের বিদ্যুৎচালিত পাম্পও নেই আর সেই পাম্প চালানর টাকাও নেই। তাই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে লম্বা গাছেদের মাথার কাছে ঝাঁকড়া পাতা সব জলাভাবে ভোগে।

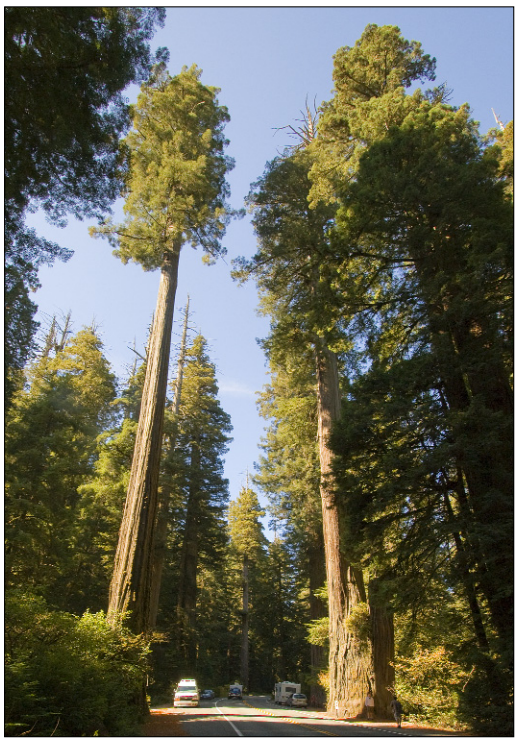

রেড উড

সেডার

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে গাছের জল ব্যবহারের পদ্ধতি আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত। খুব উঁচু ডালের পাতাতেও জলের ঘাটতি দেখা যায় না। সেগুলি অন্য সব পাতার মতোই সজীব। এবং এও দেখা গেছে গাছেরা যে সব তন্তুর সাহায্যে শেকড় থেকে ওপরের দিকে জল নিয়ে যায়, সেগুলি মিলিয়ে যেতে থাকে একটা উচ্চতার পর। তাহলে মগডালে জল যায় কী ভাবে? উঁচুতে ঝুলে থাকা পাতা জল পায় কী করে? পায় বাতাস থেকে। গাছের শরীরে এমনই ব্যবস্থা আছে যে তারা হাওয়ায় মিশে থাকা বাষ্প শুষে নিতে পারে। জল সরবরাহের জন্য এই দু'রকম পদ্ধতিই কাজে লাগায় গাছ। একটা স্তর পর্যন্ত তাদের শরীরের পাম্পগুলি মাটি থেকে জল ক্রমাগত ওপরে তুলতে থাকে। আর তারও ওপরে যেখানে পাম্পের সাহায্যে জল পাঠানর কাজটা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে, সেখানে আছে তাদের শরীরে এক আশ্চর্য ধরনের বিকল্প যন্ত্র যা বাতাস থেকে জল আলাদা করে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে দিতে পারে।

আশ্চর্য প্রকৃতি

আমেরিকার 'রেড উড' আর জাপানের 'সেডার' – পৃথিবীর এই দুই আকাশচুম্বী গাছের ওপর গবেষণা করে এ কথা জানা গেছে। **সূত্রঃ কোবে ইউনিভারসিটি**

বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে

পৃথিবীর উষ্ণতম বছরটি শেষ হল।'ওয়ার্ল্ড মেটেরিওলজিকাল অরগানাইজেশন' বা বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা জানিয়েছে ২০১৫ এখনও পর্যন্ত সব চেয়ে বেশি গরম বছর হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অর্থাৎ যখন থেকে পৃথিবীর তাপমাত্রা নথিভূক্ত করা হয়ে আসছে, সেই সব বছরগুলির মধ্যে ২০১৫ সালই হচ্ছে উষ্ণতম। আবহাওয়াবিদরা বলছেন ২০১৬ আরও গরম হবে। তাঁরা বলছেন এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে পৃথিবীর এই উষ্ণায়ন রোধ করা যায়। পাঁচ বছর আগে সব দেশ ঠিক করে

যে বিশ্বজুড়ে কলকারখানার যুগ শুরু হওয়ার আগে যে গড় তাপমাত্রা ছিল, পৃথিবীর উষ্ণতা তার থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি কিছুতেই বাড়তে দেওয়া যায় না। পারদরেখা যদি তার মধ্যে আটকে না যায়, তাহলে পৃথিবী জুড়ে নেমে আসবে এমনই এক গভীর সংকট যা থেকে নিস্তার পাওয়ার উপায় নেই।

আগুন আর অরণ্য

এক সময় আগুন ছিল অরণ্যের বন্ধু। কিন্তু এখন সে ধ্বংসকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে এই বনের আগুন বা দাবানল শ'য়ে শ'য়ে ঘর-বাড়ি, শহর এমনকী কিং ক্যানিয়ন ন্যাশনাল পার্কও প্রবল হুমকির মুখে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক'র একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে গত নভেম্বর পর্যন্ত দাবানল দেশের ৯০ লক্ষ ৮০ হাজার হেক্টর পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। এবং দেখা যাচ্ছে গত এক দশকের মধ্যে ২০১৫ সালই ছিল সর্বাধিক 'ফায়ার ইয়ার' বা আগুনে বছর।

এই দাবানলই ১৯১০ সালে নর্দান রকিস'র ৩০ লক্ষ একর বনাঞ্চল ভস্মীভূত করেছিল। এবং সেই আগুনে ৭৮ জন আগুন নিয়ন্ত্রণকর্মি নিহত হয়েছিলেন এক বিকেলেই। আসলে অরণ্যের মধ্যেই শুকনো কাঠ, শুকনো পাতা ও আরও নানা দাহ্য জিনিস থাকে যা সহজেই আগুন ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে।

দেরি হয়ে যাচ্ছে

১ পাতা থেকে

থাকবে না।

উষ্ণায়ন ঠেকানোর একটাই পথ – গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমান কমানো। কিন্তু আবহাওয়াবিদরা বলছেন ২০১০ সালের পর পাঁচ বছর কেটে গেলেও কাজের কাজ তেমন হয় নি। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে আবারও বসছে বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন। তাতে সমস্ত দেশের প্রধানরা একত্রিত হচ্ছেন একটা উপায় খুঁজতে। আর ঠিক তার আগে আবাহাওয়া বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, খুব দেরি হয়ে যাচ্ছে। এখনই যদি উষ্ণায়ন রোখার কাজ পুরো দমে শুরু না করা যায়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ২ ডিগ্রির বদলে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যেতে পারে, যার ফল হবে মারাত্মক। প্যারিস থেকে আগামী দিনের জন্য কী বার্তা আসে সেটাই এখন দেখার।

সূত্রঃ রয়টার

মাটির তলায় কত জল, হিসেব এবার

পৃথিবীর মাটির নীচে সঞ্চিত আছে জল। বহুকাল আগে থেকেই মানুষ পৃথিবীর সেই জল ব্যবহার করছে। কুয়ো বা পরবর্তিকালে টিউব-ওয়েল থেকে আমরা যে জল পাই তা মাটির তলারই জলভান্ডার থেকে আসে। মাটির নীচে নানা স্তরে নানা বয়সের জল আছে। কোথাও কোথাও তাদের বয়স হয়ত ছ'মাস। গত বর্ষার জলই হয়ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে অগভীর জলস্তরে জমা হয়েছে। কুয়ো খুঁড়লে বা টিউবওয়েল বসালে মাটির খুব নীচে না গিয়েও আমরা সে জলের নাগাল পেয়ে যাই। আবার কোথাও মাটির খুব গভীরে প্রকান্ড জলাধারে এমনও জল মজুত আছে যা হয়ত এক কোটি বছরের পুরনো। সে জলের কাছে আমরা পৌঁছতে পারিনা এখনও। মাটির তলার যে জল আমরা ব্যবহার করি, বলা হচ্ছে তা সবই সাম্প্রতিক কালের – হয়ত ৫০, ১০০, ২০০ বছরের পুরনো।

আজকের দিনে দেশে দেশে ভূগর্ভের জলের চাহিদা বেড়েই চলেছে। চাষের কাছ, কলকারখানা আর মানুষের প্রতিদিনকার জলের প্রয়োজন অনেকটাই মেটায় ওই মাটির তলার সঞ্চিত জল। আর সেই জলের ব্যবহার দিন দিন এতোই বাড়ছে যে ভূগর্ভে তার স্তর নেমে যাচ্ছে ক্রমশ। ফলে জল পেতে পাইপ বসাতে হচ্ছে অনেক গভীরে। তাই পৃথিবীর মাটির তলায় কত জল আছে তা জানা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ এই জলের ভান্ডার যদি কোনও দিন নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে তো মানুষের বেঁচে থাকই কঠীন হয়ে উঠবে।

ইউনিভারসিটি অফ ভিক্টরিয়া আর ইউনিভারসিটি অফ টেক্সাসের যৌথ গবেষণায় জানা গেছে ভূগর্ভে এখনও ২.৩০ কোটি ঘন কিলোমিটার জল মজুত আছে। কিন্তু মাটির খুব নীচে যে জল আছে, তা অতি প্রাচীন। তাতে নানা ধাতুর মিশ্রনের মাত্রাও বেশি। এমনকী তার স্বাদও বেশ নোনতা। বলা হচ্ছে কোথাও কোথাও সমুদ্রের জলের চেয়েও লবনাক্ত সে জল।

ভূগর্ভের জলভান্ডার কোথায় বেশি? গবেষণা থেকে জানা গেছে দক্ষিণ আমেরিকার অ্যামাজন বেসিন, উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকার কঙ্গো, আর এশিয়ার ইন্দোনেশিয়ায়। আর সব থেকে কম জল আছে সাহারা মরুভূমির নীচে। তবে বিপুল মাত্রায় মাটির নীচের জল তোলার ফলে পৃথিবীর অনেক জায়গায় তার স্তর সঙ্কটজনক ভাবে নেমে গেছে। তেমন কয়েকটি জায়গা হল উত্তর ভারত, পাকিস্তান, উত্তর চিন, ইরান, সাউদি আরব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু অঞ্চল আর মেক্সিকো।

সূত্রঃ ইউরেকা অ্যালার্ট

মঙ্গলে জল, আভাস অন্য কিছু গ্রহেও

নানা দেশের নানা বিজ্ঞানী এখন মহাবিশ্বে জলের খোঁজে ব্যস্ত। আর যত দিন যাচ্ছে ততই বিশ্বের এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকা এমন সব গ্রহের হদিস পাওয়া যাচ্ছে যেখানে জল থাকার সম্ভাবনা ক্রমেই উজ্জ্বল হচ্ছে। আর মহাকাশ বিজ্ঞানী গ্রহগ্রহান্তরে এত সময় আর অর্থ ব্যয় করে জলের খোঁজ করছেন তার একটা কারণ হল তাঁরা জানতে চাইছেন আমাদের এই পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি না। কারণ, মনে করা হয়, যেখানেই জল সেখানেই প্রাণের বিকাশের সম্ভাবনা থাকে।

ইতিমধ্যেই আমাদের প্রতিবেশি গ্রহ মঙ্গলে জলের অস্তিত্ব প্রমানিত হয়েছে। মাটির তলার জল ওপরে উঠে মাটিকে স্যাঁৎস্যাঁতে করে তুলতে দেখা গেছে বলে জানিয়েছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসা **(ছবি)**। এখন সেখানে প্রাণের সন্ধান মেলে কি না সেটাই দেখার।

আর কোথায় জল পাওয়া গেছে?

সেরেস: একটি ক্ষুদে গ্রহ। নাসা বলছে তার ২৫% বরফে ঢাকা। তরল জলও থাকতে পারে।

টাইটান: স্যাটার্ন-এর চাঁদ। মনে করা হচ্ছে এক অতি লবণাক্ত জলভান্ডার রয়েছে সেখানে।

প্লুটো: ক্ষুদে গ্রহ। নাসা-র মহাকাশযান 'সিউ হরাইজন'-এর পাঠানো তথ্য থেকে জানা গেছে সেখানে বরফ-জমা জল আছে।

মিমাস: স্যাটার্নের চাঁদ। তার মাটির নীচে এক বিরাট সমুদ্র আছে বলা হচ্ছে।

এনসেলেডাস: স্যাটার্নের আর এক চাঁদ। বলা হচ্ছে এর মাটির নীচেও আছে এক বিশাল সমুদ্র।

গ্যানিমিড: জুপিটারের চাঁদ। আমাদের সৌরমন্ডলের সব চেয়ে বড় উপগ্রহ। অনুমান করা হচ্ছে সেখানেও আছে বিরাট সমুদ্র।

ইউরোপা: জুপিটারের অন্য এক চাঁদ। জলের সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে এখানেও।

ক্যাল্লিস্টো: জুপিটারের আরও এক চাঁদ। বলা হচ্ছে তার বরফ-ঢাকা মাটির নীচে সমুদ্র থাকতে পারে।

মার্কারি: পৃথিবীর আর এক প্রতিবেশি গ্রহ। নাসার 'মেসেঞ্জার-২' মহাকাশযান দেখিয়েছে তার মেরু অঞ্চলে আছে জমাট বরফ।

সূত্রঃ ডাউন টু আর্থ

কটনটপ ট্যামারিন

মাথা থেকে ঘাড় অবধি সাদা তুলোর মতো চুল বলেই বোধহয় দক্ষিণ অ্যামেরিকার ক্রান্তীয় ঘন অরণ্যের এই বাসিন্দার নাম ‘কটনটপ ট্যামারিন’। মাত্রই ১৭ সেন্টিমিটার লম্বা আকারে কাঠবেড়ালির মতো এই ট্যামারিনরা দল বেঁধে থাকে। ফলপাকুড় আর পোকামাকড়ই তাদের খাদ্য। তাই অরণ্যে গাছের বীজ ছড়ানোর কাজে তাদের বড় ভূমিকা থাকে। খাবারের সন্ধান পেলে, বিপদে পড়লে - ভিন্ন ভিন্ন ডাক ডেকে দলের সদস্যদের সঙ্গে তারা যোগাযোগ করে। মনে করা হয় ১৯৭৬ সালে তাদের সংরক্ষিত প্রাণী হিসেবে ঘোষণা এবং তাদের নিয়ে আন্তর্জাতিক ব্যবসা বন্ধের আগে পর্যন্ত প্রায় ৪০,০০০ কটনটপ ট্যামারিন ধরে রপ্তানি করা হয়েছে চিকিৎসা শাস্ত্রে গবেষণার জন্য। ফলে এখন তারা অত্যন্ত বিপন্ন’র তালিকায় অন্তর্ভূক্ত।

শুধু দেব-দেবী নয়, ত্রিনয়ন আছে মানুষেরও

আমাদের তেত্রিশ কোটি দেব দেবীর অনেকেরই ত্রিনয়ন বা তৃতীয় নেত্র আছে। এবং দেবী দুর্গা, কালীকে ‘ত্রিনয়নী মা’ সম্বোধনে রচিত কত ভক্তিগীতিই তো শোনা যায়। তবে শুধু দেব দেবী নয়, ওই ত্রিনয়ন বা থার্ড আই আমাদের সকলেরই আছে। হ্যাঁ তাকে দেখা যায় না বটে, কিন্তু সে আছে আমাদের অগ্রমস্তিষ্কের ডায়েনসেফালন অঞ্চলে, তৃতীয় মস্তিষ্ক নিলয়ের পৃষ্ঠ দেশে।

এই ত্রিনয়নের অবশ্য আরও নাম আছে। যেমন পিনিয়াল বডি, এপিফাইসিস সেরিব্রি, এপিফাইসিস কোনারিয়াম অথবা তৃতীয় চক্ষু। মজার কথা আমরা তাকে চর্মচক্ষে দেখতে না পেলেও আকৃতিতে সে চোখের মতোই ডিম্বকার। এই থার্ড আইও কিন্তু দেখতে পায়। এবং সাদা চোখে যা দেখা যায় না ওই তৃতীয় চক্ষু তাই দেখে ফেলে। অনেক আগে পড়েছিলাম এই পিনিয়াল গ্ল্যান্ড বা গ্রন্থিটিকে জাগ্রত করতে হলে অনেক কসরত করতে হয়। বৌদ্ধধর্মে না কি এই

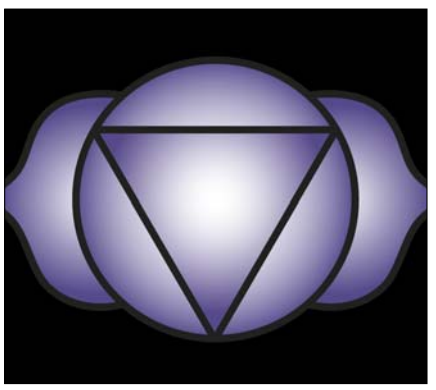

গ্রন্থিটিকে সবার আগে জাগ্রত করা হয়।

এবং বারানসীতে পুন্যার্থীরা গঙ্গায় যে পয়সা ফেলেন, তীরে বসেই নির্ভুল ভাবে তা না কি ওই পয়সা সংগ্রহকারীদের বলে দেওয়া যায় কোথায় ডুব দিলে সেই পয়সার নাগাল পাওয়া যাবে। ওই ত্রিনয়ন জাগ্রত হলে আরও অদ্ভূৎ সব কান্ডকারখানা করা যায়।

আসলে পিনিয়াল গ্রন্থি আদতে একটি এন্ডোক্রিন গ্ল্যান্ড-যেখান থেকে মূলত মেলাটোনিন হরমোন তৈরি হয়। আমাদের নিদ্রা ও জাগরণ তথা জেগে থাকা ও ঘুমিয়ে থাকা অবস্থার নানা পরিবর্তনে যে হরমোনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। মেলাটোনিনকে তাই স্লিপ হরমোনও বলা হয়।

এরোপ্লেনে এক সময়-অঞ্চল থেকে অন্য সময়-অঞ্চলে ভ্রমণের সময় জেট ল্যাগ হয়, যা কাটাতে ওই মেলাটোনিন বেশ কার্যকর ভূমিকা নেয়। অনেকে এটাকে জৈব ঘড়িও বলেন যা আমাদের দেহের সারকাডিয়ান ছন্দ নিয়ন্ত্রণ করে। সারকাডিয়ান ছন্দ হল মানবদেহের ভেতরে ছন্দ নিয়ন্ত্রণকারী একটি বিশেষ ঘড়ি।

ডঃ কজ্জল চট্টোপাধ্যায়

আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে, দিন গুনছে বহু প্রাণী

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্ব-প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন ঘটছে তার প্রভাব পড়ছে মানব জীবনে। পড়ছে উদ্ভিদসহ তাবৎ প্রাণী কুলের ওপর। এবং সেই পরিবর্তন, সেই প্রভাব সমস্ত প্রাণিজগতের ধ্বংসকে কতটা ত্বরান্বিত করতে পারে তা জানা না গেলেও, তার একটা আভাস যেন পাওয়া যাচ্ছে। যেমন -

● বিংশ শতাব্দী থেকে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বেড়েছে ০.৬ থেকে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

● অরণ্য ধ্বংস ও জমির ব্যবহারে পরিবর্তনের দরুন প্রতিবছর পরিবেশে কার্বন নির্গমন বাড়ছে ১৫%।

● সোনালি ব্যাঙই প্রথম প্রজাতি যে জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

●জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পোকা মাকড়ের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘঠছে, যা ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার মতো মারণ রোগের কারণ হয়ে উঠছে।

● হ্যারিকেন, ক্যাটরিনা’র মতো বিধ্বংসী ঝড়, খরা ও প্রবাল কীটদের মৃত্যুর মতো আরও বহু প্রাকৃতিক বিপর্যয়

ঘটছে এই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে।

● জলবায়ু পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণে প্রতি বছর প্রায় ৬ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়, যার মধ্যে ৯৫% ই ঘটে উন্নয়নশীল দেশে।

● শুধু ইউরোপেই ২০০৩ এ প্রায় ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া জনিত অসুখে।

● মনে করা হচ্ছে আগামী ২০ বছরে প্রতি দশকে বিশ্ব তাপমাত্রা বাড়বে ০.২ ডিগ্রি করে।

● অক্সফাম’র সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ খাদ্য শস্যের দাম আরও ৫০/৬০ শতাংশ বেড়ে যেতে পারে।

● আমাদের এই নীল গ্রহ’র ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মারাত্মক হতে পারে। যেমন তাপমাত্রা খুব বেড়ে যাওয়া, সমুদ্রের জলতল উঁচু হয়ে ওঠা, বন্য প্রজাতির বিলুপ্তি, বৃষ্টিপাতের ধরন বদলে যাওয়া, তাপ প্রবাহ, শক্তিশালী ঝড়ের দাপট, দাবানল এবং দ্রুত মেরু বরফের গলন ইত্যাদি নানা অঘটন। **সূত্রঃ কনজার্ভ-এনার্জি-ফিউচার.কম**

হিমবাহ গলছে, বড় হচ্ছে হিমালয়ের হ্রদ

পৃথিবীর নানা জায়গায় লেক বা জলাশয় শুকিয়ে যাওয়ার বা ছোট হয়ে আসার খবর মাঝে মাঝেই মেলে। তবে জলাশয় আকারে বড় হয়ে ওঠার কথা তেমন শোনা যায় না। কিন্তু এমনটা ঘটছে, যা পর্বত অভিযাত্রীদের পক্ষে বেশ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠছে। বিবিসি'র একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, এটা ঘটছে এভারেস্টের কাছে খুম্বু হিমবাহের ওপর গড়ে ওঠা জলাশয়ে। দেখা যাচ্ছে সে যেন ক্রমশই তার আয়তন বাড়িয়ে চলেছে। অথচ এভারেস্ট শৃঙ্গে উঠতে গেলে ওই হিমবাহ পেরিয়েই যেতে হয়।

আসলে বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে হিমালয়ের হিমবাহগুলি গলছে। এবং সেই গলনের ফলে অন্যান্য হিমবাহের মতো খুম্বু হিমবাহের ওপরও বরফ গলা জলে তৈরি হয়েছে ছোট ছোট পুকুর। এখন সেই গলন দ্রুত হওয়ার ফলে পুকুরগুলি পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে জুড়ে বড় লেক'র সৃষ্টি হয়েছে। এবং তাতে শুধু অভিযাত্রীদেরই নয় বিজ্ঞানীদের কপালেও ভাঁজ পড়েছে। কারণ হিমবাহের গলন অব্যাহত থাকলে ওই জলাশয়ের জল উপচে নীচের দিকে এমন প্লাবন হবে যে তাতে বিপুল জন-বসতি ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা।

গত এপ্রিলে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের পর শেফিল্ড ও লিড্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী ওই অঞ্চলে সমীক্ষা করতে গিয়েছিলেন। দলনেত্রী ড: অ্যান রোয়ান বিবিসি'কে জানান যে গত এক দশক বা তারও আগে থেকে খুম্বু হিমবাহের ওপর আলাদা আলাদা পুকুর ছিল। কিন্তু বছর পাঁচেক ধরে তারা বড় হতে শুরু করে। এবং পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে। বিশেষ করে হিমবাহের বাঁদিকে ৭/৮ বড় বড় পুকুর আছে যারা এখন জুড়ে গিয়ে একটা চেন তৈরি করেছে। এবং ওপরের দিক থেকে বরফ গলা জলের প্রবাহ ওই চেন ধরেই নীচে নেমে আসছে। তাতেই খুম্বু হিমবাহের ওপর কয়েকটি বড় লেকের জন্ম হয়েছে।

গত ১৫ বছর ধরে তাঁদের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে বছরে ২ মিটার করে হিমবাহ ক্ষয়ে যাচ্ছে। আসলে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে হিমবাহের বরফ দ্রুত গলতে থাকাটাই আশঙ্কার। কারণ ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম'র হিসেব বলছে যে, গত শতাব্দীতে নেপাল, ভূটান, পাকিস্তান ও চিনে হিমবাহ'র প্রাকৃতিক জলাধারগুলি ভেঙে পড়ার অন্তত ৩৫ ঘটনা ঘটেছে। তাই উষ্ণতা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে খুম্বু হিমবাহ'র আয়ু অনিশ্চিত হয়ে পড়বে যা পর্বত অভিযাত্রীদের কাছে মোটেই সুখের হবে না।

মাটির মধ্যে প্রাণ আছে, আমরা খেয়ালই করি না

মাটির কথা আমরা কেউ মনে রাখি না। আমাদের পায়ের তলার মাটিই যে আমাদের বাঁচার এক প্রধান উপাদান এ সত্যটা সাধারণত আমাদের চিন্তা এড়িয়ে যায়। অথচ ২০১৫ যে বছরটা আর কয়েকদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে সেটা যে 'আন্তর্জাতিক মৃত্তিকা বর্ষ' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল তা ক'জনেরই বা জানা আছে।

মাটির কথা ভাবলে শুধুই ধুলো বালি, কাঁকড়, কাদার কথাই আমাদের মনে আসে। মাটির মধ্যে যে বিস্তর প্রাণী বাসা বেঁধে থাকে আর বিপুল পৃথিবীর অসংখ্য জীবকে যে তারা খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে, আমরা তা ভেবে দেখি না। অথচ মাটির মধ্যে প্রাণের সম্ভার সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কৌতুহল দিন দিন বাড়ছে। তাঁরা বলছেন মাটি শুধু পৃথিবীর প্রাণীদের জীবন ধারণের রসদ যোগায় তাই নয়, বরং এ গ্রহের আবহাওয়া যাতে ঠিক থাকে সে ব্যবস্থাও করে। আর আবহাওয়া যদি পাল্টে যায় তাহলে সব প্রাণীই যে সঙ্কটে পড়বে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এক টুকরো মাটিকে যদি ২০ ভাগে ভাগ করা যায়, তাহলে তার নয় ভাগ হবে বালি, পাথর কুচি, ক্লে ইত্যাদি, যা হল নিষ্প্রাণ পদার্থ। বাকি ১০ ভাগের মধ্যে থাকবে জল আর বাতাস। আর এক ভাগ হবে হাজার হাজার অনুপ্রাণীর সমষ্টি, যা মাটির মধ্যে সঞ্চার করে প্রাণ। এটাই হল সাধারণ সুস্থ মাটির গঠন। তবে সব জায়গার সব মাটি যে একই রকম হবে তা নয়। বিভিন্ন জায়গায় তার কিছু কিছু নিজস্ব চরিত্র থাকে অবশ্যই। আবার বছরের সব ঋতুতেই যে মাটির চরিত্র একই থাকবে তেমনটাও নয়। তবে মাটির মধ্যে বসবাসকারী

অনুপ্রাণীদের কার্যকলাপ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকার্ষণ করেছে। কারণ তারাই নানা ভাবে মাটিকে ধরে রাখে, তার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম গলিপথ তৈরি করে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা করে। গাছের ধরে-যাওয়া পাতা, মৃত পোকামাকড়ের দেহাবশেষ, প্রাণীদের শরীরের বর্জ্য তারা তাদের নিজস্ব রসে একটু একটু করে পচিয়ে গলিয়ে সারে পরিণত করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়, যা আবার গাছেদের জন্য হয়ে ওঠে উত্তম খাদ্য। আর গাছেরা পুরুষ্টু হয়ে বেড়ে উঠে নানা প্রকার খাদ্য যোগায় পৃথিবীর সব প্রাণীদের। আবার ওই মাটিতেই থাকে 'রিজোবিয়া' নামের এক জীবাণু যারা গাছেদের জন্য খাবার 'রান্না' করে বললে ভুল হবে না। বাঁচতে হলে গাছেদের চাই নাইট্রোজেন। কিন্তু বাতাস থেকে সরাসরি নাইট্রেজেন আহরণ করার ক্ষমতা নেই গাছের। আর সে কারণেই গাছেরা রিজোবিয়ার সাহায্য নেয়। রিজোবিয়া বাতাস থেকে নাইট্রোজেন আলাদা করতে সক্ষম। আর নিজেদের রসনায় নাইট্রোজেন তারা 'অ্যামোনিয়াম' নামক এক পদার্থে পরিণত করে গাছেদের খাওয়ার জন্য দেয়। শুধু অ্যামোনিয়ামই নয়, ফসফরাসের বন্দোবস্তও করে তারা।

বিনিময়ে গাছেরা তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। শেকড়ে ছোট ছোট গোল গোল বাসা বেঁধে পাচক রিজোবিয়ার দল। আর তাদের সেই আবাসন বিশেষ ধরনের। সেখানে অক্সিজেনের প্রবেশ নিষেধ। কারণ, রিজোবিয়া অক্সিজেন পছন্দ করে না। তাদের চাই অক্সিজেন বিহীন পরিবেশ, আর গাছেরা তাদের জন্য সে ব্যবস্থাই করে। মাটির মধ্যেই প্রাণের এই আদান প্রদান চলে। আমরা জানতেও পারি না।

সূত্রঃ স্টুডেন্ট সায়েন্স

দৈত্যাকার অজগর ভারতের সব জঙ্গলে আছে

অ - অজগর আসছে তেড়ে - একেবারে শৈশবে এভাবেই আমাদের অনেকের বর্ণপরিচয় শুরু হয়। তবে অজগর তেড়ে আসছে - তেমনটা ঠিক শোনা যায় না। বরং বিশালদেহী এই ইন্ডিয়ান পাইথন বা অজগর চলাফেরায় বেশ ধীরগতি। এবং সহজে যেন চলা ফেরা করতেই চায় না। এমনকী তারা নিজেরা আক্রান্ত হলেও কমই আক্রমণ করে এতোটাই কুঁড়ে তারা। আমেরিকার অ্যানাকোন্ডার মতোই দৈত্যাকার প্রায় ২০ ফিট লম্বা এই সাপটিকে ভারতের সমস্ত জঙ্গলেই দেখা যায়। নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কাতেও তাদের দেখা মেলে। তবে বাসস্থান ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে থাকায় হুমকির মুখে পড়েছে তারা।

বিপন্ন যারা

বিপন্নতা বাড়ছে তাদের চামড়া আর রক্তের চাহিদা মেটাতেও। থাইল্যান্ডের বাজারে নাকি ফরমায়েশ মতো এই অজগর জ্যান্তোই মারা হয়, যাতে ক্রেতারা তার ফ্রেশ রক্ত পান করতে পারে, যার ওষধি মূল্য না কি অপিরসীম। এবং জীবিত অবস্থাতেই তাদের ছালও ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। কেননা তাতে না কি খুব উৎকৃষ্ট হয় চামড়ার গুণগত মান। এবং ফ্যাশন জগতে সেই সাপের চামড়ার জুতো, বেল্ট, পার্স'র কদরও খুব।

খুবই বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এই অজগরদের বসবাস। এমনি জঙ্গল ছাড়াও ঘাসের বন, বাদা-বন, পাহাড়ি পাথুরে অরণ্য এমনকী নদী উপত্যকা ইত্যাদি সর্বত্রই তাদের বিচরণ ক্ষেত্র। ধীরগতি হলেও অজগররা কিন্তু দারুন সাঁতারু। এবং জলাশয়ও তাদের ঘরবাড়ির মতোই। জলের নীচে প্রয়োজনে অনেকক্ষণ ডুবে থাকতে পারে তারা।

সাদাটে-বাদামি ছোপ বা হলদেটে-কালচে বাদামি ছোপ এই অজগর সাধারনত ৮-১০ ফিট লম্বা হয়। দৈর্ঘে ৩২ ফিট পর্যন্ত অজগরের সন্ধান পাওয়া গেছে। তারা একাকী ঘুরে বেড়ায়। বছর কুড়ি বাঁচে। একবারে ১০০ পর্যন্ত ডিম পাড়তে পারে। অন্যান্য সাপের মতোই তারাও মাংসাশী। স্তণ্যপায়ী ছাড়াও তারা পাখি, সরীসৃপ খায়। বিষ নেই বটে

তবে যে কোনও মাঝারি আকৃতির প্রাণীকে পেঁচিয়ে পিষে মেরে ফেলতে পারে। প্রথমে শিকারকে লেজে জোরসে কয়েক প্যাঁচ জড়িয়ে তার শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে দেয় তারা, তারপর মাথার দিক থেকেই একটু একটু করে তাকে গিলতে শুরু করে। এবং মোটামুটি একটা শিকার ধরতে পারলে বেশ কয়েক সপ্তাহ তাদের আর খাদ্যের প্রয়োজনই হয় না। এমনকী এও দেখা গেছে যে বড়সড় শিকার গলাধকরণের পর সর্বোচ্চ সময় ২ বছর পর্যন্ত তার আর শিকার ধরার দরকার হয় নি।

মানুষ ছাড়াও ঈগল, হায়েনা, লেপার্ড, বাঘ, কুমীরের মতো তার শত্রুরা প্রকৃতিতে ঘুরে বেড়ায়। চাষাবাদে ক্ষতিকর পোকামাকড়, ইঁদুর, ছুঁচো খরগোস ইত্যাদি খেয়ে এই সাপেরা বন্ধু প্রাণীর কাজ করে। দেখা গেছে যেখানে মানুষ তাদের মেরে সাফ করেছে সেখানে ইঁদুরের উৎপাত বেড়েছে এবং তাদের বাহিত রোগ ব্যাধি রীতিমতো জনস্বাস্থ্যের পক্ষে হুমকি হয়ে উঠেছে।

সাধারণত অজগর মারা হয় ভয়ে। খাদ্যের চাহিদা মেটাতে এবং রক্ত ও চামড়ার জন্য মারা হয়। পাশাপাশি গাছপালা জঙ্গল কেটে চাষের জমি তৈরির জন্যও তারা নানা জায়গা থেকে উৎখাত হয়ে যাচ্ছে। জীবিত অজগর বা তার দেহাংশ পাচার আইনত নিষিদ্ধ হলেও কে আর সেই আইন মানছে। ফলে তাদের জীবনের ঝুঁকি বেড়েই চলেছে ক্রমশ।

সূত্রঃ উইকিপিডিয়া, বাঘেরা.কম

জীবাণুরা অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। অসুখ সারানো তাই কঠীন হয়ে উঠছে দিন দিন।

ডাউন টু আর্থ রিপোর্ট

RNI Regn No. WBBEN/2000/1531 Date of Publication: December 1, 2015 Postal Regn No.KOL RMS/262/2013-15

অবাক পৃথিবী

● সারা পৃথিবীতে নয় নয় করেও প্রায় ৪০ কোটি কুকুর আছে।

● ব্যাঙেরা কিন্তু জল খায় না, শরীরের চামড়া দিয়ে জল তারা শুষে নেয়।

● বুনো বাঘের থেকে এখন আশ্রয়ে থাকা বাঘের সংখ্যাই বেশি।

● একটি প্রাপ্তবয়স্ক হাতির পানের জন্য দিনে অন্তত ২১০ লিটার জল প্রয়োজন হয়।

● একটা নয় দুটো নয়, চার চারটে পাকস্থলী থাকে জিরাফদের। বাড়তি পাকস্থলীগুলি তাদের খাবার হজম করতে সাহায্য করে।

● টোম্যাটো সাধারণত লালই হয়। তবে চাষ করে হলুদ, কমলা, সবুজ, গোলাপি, কালো সাদা টাম্যাটোও ফলানো যায়।

অ্যামাজনের অর্ধেক প্রজাতির গাছ বিপন্ন

প্রায় ১৫,০০০ প্রজাতির গাছের আবাসভূমি অ্যামাজন অরণ্যের অর্ধেক প্রজাতিই হুমকির মুখে। এবং তারা যে বিলুপ্ত হতে পারে, আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীরা সেই ব্যাপারে সতর্ক করছেন বিশ্বকে। সম্প্রতি বিবিসি'র একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে, নতুন প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী অ্যামাজনের ৫৭% গাছ হুমকির মুখোমুখি হতে পারে।

এমনিতে অ্যামাজনের অরণ্যাঞ্চল সেই পঞ্চাশের দশক থেকে প্রতিদিনই ধ্বংস হয়ে চলেছে। কিন্তু সেই ক্রমবর্ধমান ধ্বংসের ফলে এক একটি প্রজাতির উদ্ভিদের ওপর তার কতটা পভাব পড়ছে সেই বিষয়ে কিন্তু খুবই কম জানা যায়। একুশটি দেশের ১৫৮ জন বিজ্ঞানী সমীক্ষা চালাচ্ছেন। সায়েন্স অ্যাডভান্সেস জার্নালে প্রকাশিত তাঁদের গবেষণাপত্র বলছে যে, অ্যামাজনের ৩৬ - ৫৭ শতাংশ উদ্ভিদই ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার বা আই ইউ সি এন'র লাল তালিকায় হুমকির সম্মুখীন বলে বিবেচিত।

পৃথিবীর ডায়েরি

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩০ টাকা (ডাক মাশুল সহ)

স্কুল, কলেজ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যে কোনও অন্য সংস্থা অথবা ব্যক্তিবিশেষ এই পত্রিকার গ্রাহক হতে পারেন। মানি-অর্ডার বা চেক দ্বারা টাকা পাঠান। চেক লিখবেন Prithibir Diary নামে।

যোগাযোগের ঠিকানা:
প্রকাশক
পৃথিবীর ডায়েরি
সি-এল ২৫৫, সেক্টর-২, সল্ট লেক, কোলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪/৯৪৩৩০৪৬৬৯৫

পাতিরাম

(কলেজস্ট্রিট-হ্যারিসন রোড ক্রসিং)
পৃথিবীর ডায়েরি পাওয়া যায়

ক্যুইজ?!?!

১। রাজধানীর বিচারে এই দেশগুলির মধ্যে কি মিল?
(ক) সেনেগাল (খ) বাংলাদেশ (গ) আয়ারল্যান্ড (ঘ) কাতার

২। আজ অবধি মাত্র দু জন (রামবরণ যাদব আর বিদ্যাদেবী ভান্ডারী) কোন পদে নির্বাচিত হয়েছেন?
(ক) উত্তারঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী (খ) নেপালের রাষ্ট্রপতি (গ) মরিশাসের প্রধান মন্ত্রী (ঘ) ভারতীয় মহিলা ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান

৩। বীরেন্দ্র সেহবাগ সম্বন্ধে এর কোনটি সত্য নয়?

(ক) প্রথম ভারতীয় যিনি টেস্টে ট্রিপল সেঞ্চুরি (৩০০-র বেশি) করেন (খ) মার্চ ২০০৯ এ একদিনের ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৬০ বলে সেঞ্চুরি করেন, এখনও ভারতীয় রেকর্ড (গ) মার্চ ২০০৮ এ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ২৭৮ বলে ৩১৯ রান করেছিলেন, যা কি না এখনও টেস্টে দ্রুততম ট্রিপল সেঞ্চুরি (ঘ) সাতবার টেস্টে শতরান করেছেন ১০০ রও কম বলে

৪। নীচের কোন দেশে আজকে মহিলাদের গড় আয়ু সব থেকে কম?
(ক) ভারত (খ) নেপাল (গ) ভিয়েতনাম (ঘ) বাংলাদেশ

৫। শততন্ত্রি বীণার এখন কি নাম?
(ক) সিন্থেসাইজার (খ) সরোদ (গ) সন্তুর (ঘ) সারেঙ্গি

৬। টাকলামাকান মরুভূমি কোন দেশে?

(ক) চিলি (খ) মরোক্কো (গ) তাজিকস্তান (ঘ) চিন

৭। আফিঙের উৎপাদন কোথায় সব থেকে বেশি?
(ক) ভারত (খ) মেক্সিকো (গ) মায়ানমার (ঘ) আফগানিস্তান

৮। অত্যাচারি রোমান সম্রাট গাইউস সিজার বেশি পরিচিত ছিলেন ক্যালিগুলা নামে। নামটি তার পছন্দ ছিল না কারণ কথাটির মানে -
(ক) গরম চামড়া (খ) খারাপ হয়ে যাওয়া দুধ (গ) ছোট জুতো (ঘ) কালো পাখি

৯। এর মধ্যে কোন দেশে সওহিলি একটি সরকারি ভাষা?
(ক) মালি (খ) দক্ষিণ আফ্রিকা (গ) নাইজেরিয়া (ঘ) তানজানিয়া

১০। উটপাখি, রেহা এবং এমু- এদের সক্কলের পক্ষে নীচের কোনটি সত্য নয়?
(ক) মানুষের থেকে উঁচু হয় (খ) উড়তে পারে না কিন্তু খুব জোরে ছুটতে পারে (গ) আত্মরক্ষার জন্য লম্বা এবং শক্তিশালী পা ব্যবহার করে (ঘ) সব দেশে পাওয়া যায়।

উত্তর: ১/সকলের রাজধানীর নাম ইংরেজি ডি অক্ষর দিয়ে শুরু যথাক্রমে- ডাকার, ঢাকা, ডাবলিন এবং দোহা; ২/খ; ৩/খ (২০১৩ বিরাট কোহলি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৫২ বলে ১০০ রান করেন); ৪/ক; ভিয়েতনাম(৮০), বাংলাদেশ(৭১), নেপাল(৭০), ভারত(৬৮); ৫/গ; ৬/ঘ; ৭/গ; ৮/গ; ৯/ঘ; ১০/ঘ; উটপাখি থাকে আফ্রিকাতে, রেহা থাকে দক্ষিণ আমেরিকাতে, এমু থাকে অস্ট্রেলিয়ায়।

স্বত্বাধিকারি অনীশ গুপ্তর পক্ষে তাঁর দ্বারা ইন্সট্যান্ট প্রিন্ট. ৭০এ, এস.এন. ব্যানার্জি রোড. কোলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক: মালবী গুপ্ত। যোগাযোগ: সি-এল ২৫৫, সল্টলেক-২, কলকাতা-৭০০০৯১। ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪। ই-মেল: prithibir_diary@rediffmail.com